সাম্যবাদ বুলেটিন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● চতুর্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা) ● ডিসেম্বর ২০১৮ ● দুই টাকা

আমাদের আহ্বান

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারবে কি না তা নিয়ে সংশয় কাটেনি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার 'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন'-এর পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। আমাদের দলসহ বাম গণতান্ত্রিক জোট এবং অন্যান্য বিরোধী দল দাবি তুলেছিল – নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ, পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া, নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকার গঠন ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে। এসব দাবি স্বৈরতান্ত্রিক মহাজোট সরকার মানেনি। তারপরও জনগণের ভোটাধিকারসহ গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, নির্বাচন কমিশন সকল দলের জন্য সমান সুযোগ ও পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে না। আপনাদের প্রতি আমাদের আহ্বান – সকল বাধা উপেক্ষা করে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন, আওয়ামী দুঃশাসনের অবসান ঘটান এবং ধনিকশ্রেণীর দ্বি-দলীয় অপরাজনীতির বিপরীতে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তিকে জয়যুক্ত করুন।

বাসদ (মার্কসবাদী) কোদাল প্রতীক নিয়ে ১০টি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে। গত ৪৭ বছর ধরে এদেশের মানুষ পালাক্রমে বিএনপি-আওয়ামীলীগ-জামাত-জাতীয় পার্টিকে ভোট দিয়েছে আর ঠকেছে। এরা জনগণকে বারবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু পূরণ করেনি। আবার গত দশ বছর ধরে আওয়ামী দুঃশাসনে পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙে দিয়ে লুটপাট, দুর্নীতি হয়েছে; স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় দেশ পরিচালিত হয়েছে। অল্প কিছু লোক সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। দেশে একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি আরও সংহত হয়েছে।

এই দ্বি-দলীয় অপরাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র শক্তি বামপন্থীরাই। তারাই অতীত দিনে এদেশের মানুষের সকলরকম অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে, তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের দাবিতে, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য, নারী নিপীড়ন বন্ধ, বাকস্বাধীনতা রক্ষাসহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের জন্য জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে।

আন্দোলনের অংশ হিসেবেই আমরা এই নির্বাচনে লড়ব। আমরা শিল্পপতি, বড় ব্যবসায়ী, কালোবাজারী, ব্যাংক লুটেরাদের টাকা নিয়ে দল চালাই না। আমাদের দল সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে গণচাঁদা সংগ্রহ করে বিভিন্ন আন্দোলন, নির্বাচন ও অন্যান্য নিয়মিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া, লোভ দেখানো, ভোট কেনাবেচার রাজনীতি আমরা করি না। আপনাদের কাছে আবেদন থাকবে – নীতি-মূল্যবোধহীন রাজনীতির বিপরীতে আদর্শবাদী শক্তি হিসেবে বামপন্থীদের শক্তিশালী করুন। আসন্ন নির্বাচনে বাসদ (মার্কসবাদী) প্রার্থীদের কোদাল প্রতীকে এবং বাম গণতান্ত্রিক জোট সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে ও ভোটের খরচ যুগিয়ে শোষিত মানুষের পক্ষের রাজনীতিকে শক্তিশালী করুন। আপনাদের প্রতিটি ভোট জনস্বার্থ রক্ষায় আন্দোলনের শক্তি ও সমাজ পরিবর্তনের রাজনীতিকে সমর্থন যোগাবে।

নির্বাচন বারবার আসবে
এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া প্রকৃত মুক্তি আসবে না

অবশেষে দশ বছর পর আরেকটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে দেশের মানুষ যাচ্ছে যেখানে প্রায় প্রতিটি ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করছে। যদিও একটা আপেক্ষিক অর্থে সুষ্ঠু নির্বাচনের কোন পরিবেশ এখনও দেখা যাচ্ছে না, পদে পদে বিরোধী দলগুলোকে বাধা দেয়া হচ্ছে, তবুও মানুষ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছেন। পর্যবেক্ষকদের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকার জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, সামান্য কারণে বিরোধীদলের মনোনয়ন বাতিল করা, নির্বাচন প্রচারাভিযানে বাঁধা প্রদান – এসবের পরও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানুষ একটা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছে। আওয়ামী দুঃশাসনে অতিষ্ঠ মানুষ যেকোনভাবেই হউক মুক্তি চাইছে। এইরকম মুক্তির আশা থেকেই একদিন তারা বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগকে জয়ী করে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিলো। ভেবেছিল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান পাবে; মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু সে আশা বৃথা গেছে। আবার নির্বাচনের ঢাক বাজছে, আবার মানুষ সেই পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু এই নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে কি? তারা কি দুঃসহ দারিদ্র, সীমাহীন অপমান আর গভীর মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন?

নদীর এক পাড় ভাঙলে মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে রাস্তায় বসে, ওপাড়ে চর পড়লে সেখানে ঠাঁই নেয়। আবার ওইপাড় যখন ভাঙা শুরু হয় তখন মানুষ আবার এপাড়ে ভিড় করে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের অবস্থাও এখন তেমনই। আওয়ামী লীগের টানা দশ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন শাসনে সবদিক থেকে নিঃস্ব হয়ে পড়া মানুষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন চাইছেন। কিন্তু সেই পরিবর্তন তাকে মুক্তি দেবে না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'Out of the frying pan into the fire' অর্থাৎ ভাজার কড়াই থেকে আগুনে গিয়ে পড়া- প্রতিবার নির্বাচনে মানুষের ভাগ্যে তাই ঘটে আসছে। আগুন থেকে কড়াই, কড়াই থেকে আগুন – এ থেকে যেন মানুষের মুক্তি নেই।

আমাদের দেশে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি- এই প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আবর্তিত হয়, জনগণও এর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওকে ক্ষমতায় নিয়ে আসেন। এই দুই দলের মধ্যে নীতি, আদর্শ ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তেমন কোন পার্থক্য নেই এ কথাটা যেমন ঠিক তেমনি এও ঠিক যে, বিগত দশ বছরে আওয়ামী লীগ দেশের যে সর্বনাশ করেছে তা পূর্বের যে কোন সরকারের তুলনায় অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, অনেক বেশি ক্ষতিকর, অনেক বেশি স্বৈরাচারী।

কোন দল ক্ষমতায়- তার চেয়ে বড় প্রশ্ন ব্যবস্থাটি কী?

দু'দলকে পালা করে ক্ষমতায় আনা হচ্ছে, তাদের সহযোগী জামাত-জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদেরও দেশের লোক দেখেছে। কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না, এর কারণ হলো দেশের স্বাধীনতার পর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ই দেশ চলেছে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি ব্যক্তিগত মালিকানাকেন্দ্রিক ও মুনাফাভিত্তিক। এখানে উৎপাদন যারা নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শ্রেণি, দেশের পুঁজিপতি-শিল্পপতিশ্রেণি কার্যত দেশের রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থনীতির যতই একচেটিয়াকরণ হয়, অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোকের হাতে গোটা উৎপাদনব্যবস্থাটাই কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়, তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে একটা একচেটিয়া ধনিক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। আওয়ামী

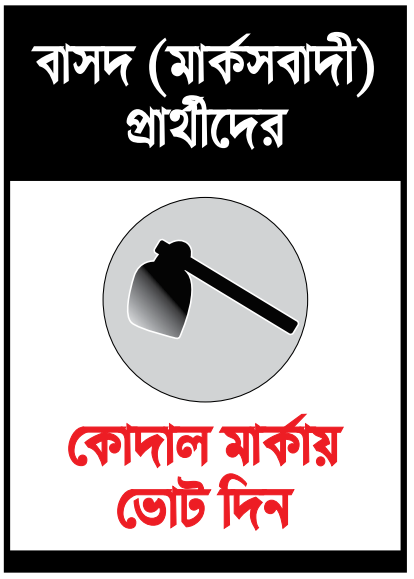

লীগ সরকারকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আনতে ও তাকে টিকিয়ে রাখতে তারা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আর দেশের সম্পদ লুট করে, অন্যায্য, অনৈতিক সুবিধা নিয়ে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আরও ধনী হচ্ছে। অন্যদিকে গরীব আরও গরীব হচ্ছে, ছোট ও মাঝারি পুঁজি বাজারে টিকে থাকতে পারছে না, বিদায় নিচ্ছে। ইউএনডিপি'র পর্যবেক্ষণ বলছে, ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে দেশের সমস্ত কিছু কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই ১০ শতাংশ দেশের মোট আয়ের ৩৮% এর মালিক। এই ১০ ভাগ লোক দেশের সমস্ত সম্পদ করায়ত্ত করে ৯০ ভাগ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে মানবেতর জীবনে। স্বাধীনতার পর থেকে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে তারা এই পুঁজিপতিদেরই সেবা করেছে, তাদেরকে পরিপুষ্ট করার জন্য সবরকম উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু গত দশ বছরে আওয়ামী লীগ যে সুবিধা তাদের দিয়েছে তা আগের ৩৭ বছরের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে।

অর্থনৈতিক চিত্র

অথচ আওয়ামী লীগ গৌরবের সাথে প্রচার করছে গণতন্ত্র একটু কম দিলেও তারা উন্নয়ন করেছে। 'উন্নয়নের গণতন্ত্র' এখন সরকারি স্লোগান।' উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে এই সরকার একথা স্বীকার করতেই হবে', 'যাই বলুন না কেন কিছু কাজ হয়েছে'- এরকম কিছু কথাও মানুষের মধ্যে সচেতনভাবে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। সরকারের এই তথাকথিত উন্নয়নকে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে জনগণের সাথে তার এই নির্লজ্জ মিথ্যাচার ধরা পড়ে যায়। যে ৭টি 'মেগা প্রজেক্ট'-কে 'ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প' আখ্যা দিয়ে এত গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে, এর পাঁচটিই প্রশ্নবিদ্ধ। এই পাঁচটির তিনটি প্রজেক্ট হলো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুকেন্দ্র প্রকল্প ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুকেন্দ্র প্রকল্প। এগুলো দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য মারত্মক হুমকি। এগুলোকে বাতিল করার দাবি নিয়ে এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে লড়ছেন। আরেক প্রকল্প 'পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর' বাস্তবে জবরদস্তি করে গড়ে তোলা, গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কোন বাস্তবতাই সেখানে নেই। ১২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি মেগা প্রজেক্ট 'মহেশখালি এলএনজি টার্মিনাল' নির্মাণ না করে দরকার ছিল এই টাকা দিয়ে পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স আরও শক্তিশালী করা; নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার, খনন ও উত্তোলনে মনযোগ দেয়া। অথচ তা করা হলো না।

তাহলে দেশের এতগুলো টাকা ব্যয় করে, বিদেশ থেকে ঋণ এনে এই 'মেগা প্রজেক্ট'গুলো নেয়া হচ্ছে কেন? অবশ্যই উন্নয়নের জন্য। সামিট গ্রুপ এলএনজি টার্মিনাল থেকে, বেক্সিমকো গ্রুপ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে, ওরিয়ন গ্রুপ ফ্লাইওভার থেকে- এরকম একচেটিয়া বিজনেস হাউসগুলোর ভালই উন্নয়ন হচ্ছে একেকটা প্রকল্পে। তার সাথে উন্নয়ন হচ্ছে সরকারি দলের কন্ট্রাক্টর, আমলা, নেতা-কর্মীদের। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একটা শ্রেণি কী পরিমাণ লাভবান হয় তা একটি পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাবে। ইউরোপে সড়ক নির্মাণে প্রতি কিলোমিটারে ২৯ কোটি টাকা, চীনে ১৩ কোটি টাকা ও ভারতে ১০ কোটি টাকা খরচ হয়। আর বাংলাদেশে গড়ে খরচ হয় ৫৯ কোটি টাকা, ঢাকা-মাওয়া চারলেনে এই খরচ ধরা হয়েছে ৯৫ কোটি টাকা। চীন, ভারত ও মালয়েশিয়ায় একটি ফ্লাইওভার তৈরি করতে কিলোমিটারপ্রতি ১০০ কোটি টাকারও কম খরচ লাগে, পাকিস্তানে লাগে ৭০ কোটি টাকারও কম, সেখানে বাংলাদেশে লাগে গড়ে ১৮৬ কোটি টাকা। ঢাকায় এতগুলো ফ্লাইওভার করা হলো যানজট নিরসনের জন্য, এখন খোদ পুলিশ দপ্তর বলছে ফ্লাইওভার যানজট কমাবে না, বরং বাড়াবে, এই পরিকল্পনা ভুল ছিল। প্রকল্প গ্রহণের সময় অনেক কথা উঠার পরও সেসবকে আমলে না নিয়ে এই পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মেগা বলি, মিডিয়াম বলি আর ছোটই বলি- কোন প্রকল্প কিংবা পরিকল্পনা জনগণের স্বার্থে নেয়া হচ্ছে না, প্রকৃতপক্ষে একটা নিরবিচ্ছিন্ন লুটপাটের অর্থনীতির চালক হলো এই প্রকল্পগুলো।

ব্যাংকগুলো থেকে হাজার হাজার কোটি লুট হয়ে বাইরে পাচার করা হচ্ছে। লুটপাটকারীরা চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাদের দেখছে না। মালয়েশিয়ায় 'মাই সেকেন্ড হোম' কর্মসূচীতে *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া প্রকৃত মুক্তি আসবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর) গত ১৩ বছরে ৩ হাজার ৬১ জন বাংলাদেশি টাকা পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশের টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকায়, অফ্রিকার দেশগুলোতে, কলম্বিয়ায়। গত ১০ বছরে দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে ৬ লক্ষ ৬ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা, এটা গোটা দেশের বর্তমান বাজেটের চেয়েও অনেক বেশি। এই টাকাগুলো দেশের মানুষের রক্ত জল করা শ্রমের টাকা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে যা তারা বিভিন্ন ব্যাংকে সঞ্চয় হিসাবে জমা করে রাখেন। অথচ কলমের এক খোঁচায় হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ হিসেবে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, সেই টাকা আবার পাবলিক মানি থেকে সরকার ব্যাংকগুলোকে দিচ্ছে, তার সুন্দর নাম আছে 'বেইল আউট'। ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সরকার সরকারি ব্যাংকগুলোকে ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি 'বেইল আউট' দিয়েছে। ব্যাংকগুলো আরও ২০,৩৯৮ কোটি টাকা 'বেইল আউট' চেয়েছে। অথচ ৫০০০-এর অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮০ হাজারেরও বেশি নন-এমপিও শিক্ষক বছরের পর বছর ধরে বেতন পাচ্ছেন না। এর জন্য বছরে ২৪০০ কোটি টাকা খরচ করার ক্ষমতা সরকারের নেই। খুলনার খালিশপুরের ২২টি পাটকল ও ৩টি অন্য কলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের অবসরভাতা বাবদ ৩'শ ৮৭ কোটি টাকা সরকার দিতে পারছে না টাকার অভাবের কারণে, অথচ এরা সারাজীবন ধরে সরকারকে সার্ভিস দিয়েছে। এদের এখন খাওয়ার টাকা নেই, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়ার উপায় নেই। রাজশাহী চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের ৫ মাসের বেতন বাবদ ৬ কোটি টাকা সরকার বরাদ্দ দিতে পারছেন না, এজন্য তাদেরকে বেতনের সমমূল্যে গুদামের অবিক্রীত চিনি দেয়া হচ্ছে। সেগুলো বাজারে বিক্রী করে আবার তারা ১৬ শতাংশ বেতন কম পাচ্ছেন। গত ছয় বছরে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের গড় মাসিক আয় বেড়েছে ৩২,৪৪১ টাকা আর সবচেয়ে গরীব ৫ শতাংশ পরিবারের গড় মাসিক আয় কমেছে ১০৫৮ টাকা। প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে গার্মেন্টস শিল্পে, সেখানে ন্যূনতম মজুরি ১৬,০০০ টাকার দাবি আজও বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাদের চাকরির সময়ের কোন ঠিক নেই, দিনে ১০/১২ ঘণ্টা এমনকি কখনও ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত তারা খাটে। শিপমেন্ট থাকলে তারা সাপ্তাহিক ছুটিও পায় না। মাত্র সাড়ে ৫ হাজার টাকার জন্য সারাদিন তাদের পাগলের মতো খাটতে হয়, অথচ তা দিয়ে কোন পরিবারের টিকে থাকাও কষ্টকর। স্বামী-স্ত্রী দুজন চাকরি করলেও চলা যায় না। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি।

দেশে একটা শ্রেণি ফুলে ফেঁপে উঠছে, আরেকশ্রেণি ক্রমাগত নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি ক্রমেই বিলীন হচ্ছে, তীক্ষ্ণভাবে শ্রেণিবিভাজন সামনে এসে পড়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চাকরি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে যুবক-তরুণরা। তরুণ বেকারের হার গত সাত বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। এ বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ১২ হাজার পদের বিপরীতে ১৯ লক্ষ লোক আবেদন করেছে। ৪০তম বিসিএসে আবেদনকারীর সংখ্যা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে ১ হাজার ৯শত তিনটি পদের বিপরীতে আবেদন করেছেন চার লক্ষেরও অধিক। গ্রামে কোন কাজ নেই। গ্রাম থেকে লোকেরা দলে দলে আসছে কাজের আশায়। এরা শহরে ভাসমান অবস্থায় রাস্তেঘাটে, দোকান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বারান্দায় রাত কাটান, তাদের থাকার কোন ঘর নেই। শুধু শ্রম বিক্রি করে তারা দিনাতিপাত করেন। কেউ কাজের আশায় পাড়ি জমাচ্ছেন বিদেশে। দেশের ১ কোটিরও বেশি শ্রমিক প্রবাসে কাজ করেন। এরা বাস্তবে 'দাস শ্রমিক' হিসেবে ব্যবহৃত হন। এদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেয়া হয় না, বাইরের সাথে যোগাযোগ রাখতে দেয়া হয় না। নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও এরা বিদেশে থাকেন. মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করেন, কিন্তু দেশে ফিরেন না, কারণ দেশে কাজ নেই। সৌদী আরবে নারী শ্রমিকদের কী অবস্থা আমরা জানি। ২০০৮-২০১৪ এই ছয় বছরে ১৪ হাজার প্রবাসী শ্রমিক লাশ হয়ে দেশে ফিরেছেন, এর মধ্যে ৯৪ শতাংশের মৃত্যুই অস্বাভাবিক। এও আছে, আবার সিঙ্গাপুরের ক্যাসিনোতে কোটি ডলারের বোর্ডে খেলছেন যুবলীগের নেতা, যিনি জুয়ার বোর্ডে বসলে লাখ ডলারের বান্ডিল নিয়েই বসেন– এ দৃশ্যও আছে।

রাজনৈতিক অবস্থা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ; আইনসভা, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ প্রায় সম্পূর্ণভাবে একক নিয়ন্ত্রণে। বর্তমান আইনসভা অর্থাৎ দশম জাতীয় সংসদে ৩০০ প্রতিনিধির মধ্যে ২৭৬ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের, এর মধ্যে ১৫৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত। ৪০ জন সাংসদ নিয়ে জাতীয় পার্টি বাস্তবে একটি সাজানো বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছে। আওয়ামী লীগের শরীকদের ছিল ১৮ জন সাংসদ, তারা বাস্তবে আওয়ামী লীগ নির্ভর দল। সেখানে বামপন্থী নামধারী কিছু দল ও নেতা ছিলেন, যাদের আজ আর বামপন্থী বলে চেনা যায় না। তারা পদ, প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার কাছে নিজেদের সততা ও আদর্শকে বিক্রি করেছেন। শত ঘাটতি সত্ত্বেও 'বামপন্থীরা সৎ' এরকম একটা ধারণা মানুষের ছিল, তাদের এই কর্মকাণ্ড বামপন্থীদের এই গ্রহণযোগ্যতাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। এই সমস্ত তথাকথিত বিরোধীরা এই পাঁচ বছরে কোন আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রেই 'না' ভোট দেননি। অর্থাৎ কোন চক্ষুলজ্জাও তাদের ছিল না। তারা আওয়ামী লীগের পদলেহন করে যে কোনভাবে তাদের এমপি-মন্ত্রীর পদ টিকিয়ে রেখেছেন। ফলে এই সংসদে একচ্ছত্রভাবে গণবিরোধী সকল আইন পাশ করিয়ে নিয়েছে আওয়ামী লীগ। এ তো গেলো আইনবিভাগের কথা।

বিচার বিভাগ নিয়ে খুব বেশি উদাহরণ দেয়ারও দরকার নেই। খোদ প্রধান বিচারপতিকে দেশ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে সরকারের বিরোধীতা করায়। এটি শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা পৃথিবীতেই একটি বিরল ঘটনা। বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নামে যথেচ্ছা মামলা দেয়া, আগে গ্রেফতার করে পরে মামলা দেখানো, গায়েবি মামলা অর্থাৎ যে ঘটনার অস্তিত্বই নেই, যা ঘটেইনি; সেটাকে কেন্দ্র করে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দেয়া, গণগ্রেফতার– এই ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে। বিএনপি'র এক একজন নেতার নামে শত শত মামলা, অপরদিকে খুনের আসামীকেও ছেড়ে দেয়া হচ্ছে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমায়– এই ঘটনাগুলো বিচার ব্যবস্থার কোমড় ভেঙে দিয়েছে। বিএনপি সরকারে থাকতে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন কম করেনি, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে খালেদা জিয়াকে অগুরুত্বপূর্ণ মামলায় এভাবে আটকে রাখা গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে সবদিক ত্যাগ করার বার্তাই দেয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আইনের শাসনের কথা বলতে গিয়ে কিছু নীতি ও সিদ্ধান্ত এসেছিল। যেমন – 'আইন সকলের জন্য সমান', 'কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়' ইত্যাদি। অথচ আমাদের দেশে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি– 'আইন বিরোধীদের দমন করার জন্য' এবং 'সরকারি দল ও দল সংশ্লিষ্ট লোকেরা আইনের উর্ধ্বে'।

আইন ও বিচার বিভাগের যখন এই অবস্থা, তখন রাষ্ট্রের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ প্রশাসনের কথা বলাটা বাহুল্যই হবে। আইন ও বিচার বিভাগ দু'টোই যদি সম্পূর্ণভাবে সরকারি দলের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়, তখন নির্বাহী বিভাগ একটা নির্দেশ পালনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, এখানে তাই হয়েছে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, সরকারি দলের প্রধান ও প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী যখন একই ব্যক্তি হন, তখন সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়। একটা চরম ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন তৈরি হয়। এই অবস্থায় কোনরকম বিরোধীতা হলেই গুম, খুন, পুলিশী হেফাজতে বিনা বিচারে হত্যা, এনকাউন্টারে হত্যা, বিনা অভিযোগে, বিনা মামলায় ধরে নিয়ে যাওয়া ও দিনের পর দিন হাজতে রাখা একটা স্বাভাবিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশের জেলগুলোর হাজতে বসবাসকারীদের মাত্র ২২ শতাংশ সাজাপ্রাপ্ত আসামী, বাকি ৭৮ শতাংশেরই বিচার চলমান। বোঝা যায়, দেশটি বাস্তবে একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

আধুনিক রাষ্ট্রে চিন্তা–ভাবনার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য, রাষ্ট্রীয় কিংবা ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংবাদপত্রের ভূমিকা খুবই গুরত্বপূর্ণ। এ কারণে সংবাদপত্রকে Fourth Estate বলা হয়। বিগত সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার আলোচনা ছাড়াই পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল বন্ধ করেছে, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের গ্রেফতার করেছে, সাংবাদিক হত্যার কোন বিচার করেনি। সম্প্রতি 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' এর মাধ্যমে আইনগতভাবে সংবাদপত্রকে সবদিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করেছে। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের নিয়ে গঠিত 'সম্পাদক পরিষদ' এর প্রতিবাদে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। যদিও এই মিডিয়াগুলো পুঁজিপতিশ্রেণিই নিয়ন্ত্রণ করে, তারা শুধু দুই দলেরই প্রচার দেয়, জনগণকে দেখায় যে এই দুই দলের বাইরে কিছু নেই। একটা মাত্রা বজায় রেখে তারা সমালোচনা করে। কিন্তু সেটাও সরকারের সহ্য হচ্ছে না।

গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রশ্ন করা ও কার্যকারণ বুঝে নেয়ার কোন আয়োজন নেই। মৌলিক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে বাজারে দাম আছে এমন বিষয় এবং কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। একদিকে ছেলেমেয়েরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বোন্নত প্রযুক্তির সাথে যুক্ত; অন্যদিকে তাদের চিন্তা ও মনন ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং পশ্চাদপদ। এই দু'য়ের মিশ্রণ একটা ফ্যাসিবাদী মনন গড়ে তুলছে। রাষ্ট্র থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভিন্ন মতের প্রতি আক্রমণাত্মক হওয়ার প্রবণতা প্রচণ্ড মাত্রায় বেড়েছে। আলোচনা ও তর্ক–বিতর্ক করা, অন্যের মত বোঝা, সঠিক হলে গ্রহণ করা–এই মানসিকতা সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, গড়ে উঠছে একটা ফ্যাসিবাদী মনন। মধ্যবিত্তরা, যারা শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়; তাদের শিক্ষার মধ্যে চিন্তা করা, বিশ্লেষণ করার কোন সুযোগ নেই আর কৃষক–শ্রমিকরা তো শিক্ষার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত। ফলে সামাজিক রুচি–সংস্কৃতির মান নিম্নগামী হচ্ছে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, অসহিষ্ণুতা, উগ্রতা ও সমাজ সম্পর্কে উন্নাসিকতা বাড়ছে।

আবার শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুবক–তরুণরা যাতে বিদ্রোহী না হয় সেজন্য তাদের নৈতিক ভিতকেই ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। দেশের যুবসমাজের ৫৩ শতাংশ নেশাগ্রস্থ। শুধু মদ, গাঁজা নয়, ইয়াবার মতো ভয়াবহ নেশার পিল দেদার বিক্রি হচ্ছে, গোটা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। মাদক এখন একটা বিরাট ব্যবসা। সরকারি দলের নেতাকর্মীদের হাত দিয়েই এর হাজার হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয়। সাথে সাথে চলছে জুয়ার ব্যবসা। প্রতিদিন ঢাকায় ১৫০টি জুয়ার স্পটেই লেনদেন হয় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। এছাড়াও কত অসংখ্য জায়গায় কত কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়, তা কেউ জানেনা। মাদক, জুয়ার সাথে চলছে পর্নোগ্রাফি। এনড্রয়েড ফোন আর ইন্টারনেটের সহজল্যভ্যতার কারণে একেবারে স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা পর্নো ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ঢাকা শহরে পর্নো ব্যবহারকারীদের ৭০ শতাংশই স্কুল ছাত্র। মাদক, নারী পাচার, পর্নোগ্রাফি– এই আন্ডারওয়ার্ল্ড বিজনেসে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খাটছে। একটা ভয়ংকর বিষাক্ত সমাজ আমাদের চোখের আড়ালে গড়ে উঠেছে। একটা প্রতিবাদহীন যৌবন সৃষ্টির চেষ্টা ছলছে প্রতিনিয়ত।

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার

আওয়ামী লীগ মৌলবাদ–সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এ ধরনের একটা ধারণা বেশ প্রচলিত। অথচ আওয়ামী লীগ শাসনামলেই অব্যাহতভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি দখল হয় ও এখনও হচ্ছে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সাথে দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ ধর্মভিত্তিক দলগুলো আছে। আওয়ামী লীগ হেফাজতে ইসলামের সাথে সখ্যতা করেছে, তাদের অন্যায় দাবিকে মেনে দিয়ে স্কুলের পাঠ্যবই পরিবর্তন করেছে। তারা শেখ হাসিনাকে 'কওমী জননী' উপাধি দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ নিজেই রাস্তাঘাটে বিজ্ঞাপন দিয়ে তার ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার কথা প্রচার করছে। এটা যে সে এখন করছে তাই নয়, আওয়ামী লীগ কোনকালেই অসাম্প্রদায়িক দল ছিল না। গোটা স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠার সময়ে তারা পাকিস্তানের বিরোধীতা করেছে ঠিক, কিন্তু জামায়াতসহ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে লাগাতার সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালায়নি। মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে নাড়াচাড়া করে রাজনীতি করাকে প্রতিবাদ করেনি। ফলে ধর্মের ব্যবহারে কি বিএনপি, কি আওয়ামী লীগ সবাই সমান দক্ষ।

পররাষ্ট্র নীতি

দেশের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে সরকার ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের নির্দেশ বহনকারী। একটা দুর্বল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হওয়ায় আমেরিকাসহ সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন দেশের প্রভাব এদেশে জন্মলগ্ন থেকেই ক্রিয়াশীল। কিন্তু ভূ–রাজনৈতিক কারণে এদেশে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপে একচ্ছত্র ভারতীয় কর্তৃত্ব কমছে। সে কারণে ভারত বাংলাদেশকে কোনভাবেই তার প্রভাব থেকে বের হতে দিতে চায় না। এখানে সে তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখছে। ভারত শুধু তার ব্যবসা কিংবা অন্যান্য স্বার্থ দেখছে তাই নয়, বাংলাদেশ কোন দেশের সাথে কোন চুক্তি করবে, দেশের ক্ষমতায় কে আসবে তাও সে ঠিক করে দিচ্ছে। আমেরিকা ভারতকে কেন্দ্র করেই এখানে তার প্রভাব রাখতে চায়। বর্তমান বৈশ্বিক মেরুকরণে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভারতের সাথে সে কোন দ্বন্দ্বে যেতে চায় না। ইংল্যান্ড দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত আঞ্চলিক নীতির ব্যাপারে আমেরিকার সাথে একমত। যদিও ইংল্যান্ড ছাড়া ফ্যান্স, জার্মানীসহ ইউরোপের অন্যান্য প্রভাবশালী দেশগুলো অনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যাপারে শুরু থেকেই বিরোধীতা করে আসছে। কিন্তু ভারত–আমেরিকা–ইংল্যান্ড এর অবস্থান ছাপিয়ে সেটা বড় কোন প্রভাব রাখতে পারেনি। *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া প্রকৃত মুক্তি আসবে না

(৩য় পৃষ্ঠার পর) তিস্তাসহ অনেকগুলো অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশ এখনও ভারতের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি, উপরন্তু ট্রানজিটসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক সুবিধা ভারতকে দেয়া হয়েছে অকাতরে। একটাও সীমান্ত হত্যার বিচার বাংলাদেশ পায়নি। একদিকে ভারতের এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন; অপরদিকে অনির্বাচিত, অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি তার সমর্থন– এসবের কারণে গড়ে ওঠা ভারতবিরোধী মনোভাবের ফায়দা তুলছে সাম্প্রদায়িক দলগুলো। আমরা ভারতের সাম্রাজ্যবাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমাদের সাধ্যমতো লড়েছি। তিস্তা আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে আমরাই চালিয়ে গেছি। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আমরাই একমাত্র 'লংমার্চ' সংগঠিত করেছি। কিন্তু সাথে সাথে আমরা মানুষকে এও দেখিয়েছি যে, ভারতের সাম্রাজ্যবাদী সরকার আর ভারতের জনগণ এক নয়। ভারতের সংগ্রামী জনগণও এই সকল ইস্যুতে আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং তাদের দেশেও তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করছে।

আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিএনপি কিংবা বিএনপির বিপরীতে আওয়ামী লীগ কোন সমাধান নয়

এই নির্বাচন এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণি বারেবারেই করছে। কিন্তু মানুষের সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না। একদলের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে কিছুদিন পর আরেক দলকে আনছে কিন্তু সমস্যা যা ছিল তাই রয়ে যাচ্ছে। অনেকেই এই সমস্যার কারণ ধরতে পারেন না বলে সমাধান তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। এই মুনাফাকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে না পারলে যে–ই ক্ষমতায় আসুক না কেন মানুষের ভাগ্য পাল্টাবে না। এক মার্কার বদলে অন্য মার্কা জিতবে, দিন বদলের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে আর বিপুল পরিমাণে লুট করা টাকা ছড়িয়ে তারা ভোট কিনবে– কিন্তু ভোটের পর মানুষ দেখবে সে যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। নির্বাচন আজ আওয়ামী লীগ–বিএনপির মতো ধনিক শ্রেণির দলগুলোর কাছে একটি বাণিজ্য। শুধু মনোনয়ন কেনা–বেচা করে এখানে দুই দলই কোটি কোটি টাকা আয় করেছে। তার মানে বোঝাই যায় যারা এত টাকা শুধু মনোনয়ন কিনতেই খরচ করছে তারা ক্ষমতায় গেলে কী করবে। অথচ বৃটিশ শাসনের সময়ে আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো রাজনৈতিক নেতা দেখেছি, পাকিস্তান আমলে মাওলানা ভাসানীকে দেখেছি। এরা মানুষের জন্য রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।

মনে রাখতে হবে, এদেশে একদিকে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিকরা ক্রমেই বাড়ছে, অন্যদিকে রাস্তা ছেয়ে আছে নিরন্ন মানুষের দল। এই দুই শ্রেণির রাজনীতিও দু'টো এবং এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। বিশেষ বিশেষ ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ আন্দোলন হবে কিন্তু সবগুলো আন্দোলনের লক্ষ্য হবে শেষ পর্যন্ত এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ। এই মুহূর্তে একটা বিশেষ সমস্যা, একটা জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে হয়তো গণআন্দোলন গড়ে উঠছে, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই যে ব্যবস্থা তাদের এই সংকটের জন্য দায়ী সে বিষয়ে লড়াইয়ে অংশ নেয়া, নেতৃত্ব দেয়া লোকেরা শিক্ষিত হচ্ছে। এই আন্দোলনগুলো থেকেই ভবিষ্যতে চূড়ান্ত অর্থে রাষ্ট্র বিপ্লবের একটা শক্তি গড়ে উঠবে।

বামপন্থীদের জঙ্গী যুক্তআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

বিভিন্ন ইস্যুতে বামপন্থীরা প্রতিক্রিয়া দেখালেও কোন একটা ইস্যু নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লেগে থেকে জঙ্গী আন্দোলন তারা গড়ে তুলতে পারেনি। জনজীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে একটা সর্বব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণের মধ্য থেকে একদল নেতা তৈরি করার কাজটা তারা করতে পারেনি। তারপরও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বামপন্থীরাই সরব ছিল। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিসহ জনজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে বামপন্থীরা দীর্ঘদিন ধরে মাঠে আছে এবং এই আন্দোলনের অংশ হিসেবেই তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। বিগত সময়ে বিবিয়ানা, সুনেত্রসহ বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন, চট্টগ্রাম বন্দরকে সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানির হাতে লিজ দেয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করে আন্দোলন, তেল–গ্যাস–বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা করার দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন, কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে আন্দোলন, অটোরিক্স চালকদের আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলন–সংগ্রামে বামপন্থীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

বামপন্থীদের জোট 'বাম গণতান্ত্রিক জোট' মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলার অংশ হিসেবেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। আমাদের দল বাসদ (মার্কসবাদী) সারা দেশে দশটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। 'মন্দের ভাল' কিংবা 'কী আর হবে আপনাদের ভোট দিয়ে, আপনারা তো পারবেন না'– এ ধরনের চিন্তা ত্যাগ করে আসুন আন্দোলনের শক্তিকে সমর্থন করি। সমর্থন ছাড়া কেউ শক্তিশালী হতে পারে না। আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা গণআন্দোলনের শক্তিকে বিকশিত হতে সহযোগিতা করবে, যা ছাড়া এই দুঃশাসনের মধ্যে নিঃশ্বাস নেবারও উপায় নেই।

বামপন্থীদের কাছে প্রত্যাশা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা। ব্যক্তি মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা এবং যে বিপ্লবের জন্য, যে সামাজিক বিপ্লবের জন্য মানুষ অপেক্ষা করছে সেই সামাজিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করা।

আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি। সেই চেতনা কোন বায়বীয় চেতনা ছিল না। যারা সেই চেতনার কথা বলে রাজনীতি করে তারা সেই চেতনার ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। সেই চেতনা ছিল বিপ্লবের চেতনা। এই যে তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, এই যে তিন লক্ষ নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে সেটা ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য নয়। একটা পুঁজিবাদী শক্তির হাত থেকে আর একটা পুঁজিবাদী শক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নয়। সেটা ছিল সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য, রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য। সেই পরিবর্তন ঘটেনি। আজকে বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটেছে তা হলো – পুঁজিবাদ মুক্ত হয়েছে, পুঁজিবাদ অবাধ হয়েছে। যারা পুঁজিবাদের ধারক-বাহক ও সুবিধাভোগী তারাই শাসন করছে, শোষণ করছে। আমাদের আন্দোলন, বামপন্থীদের আন্দোলন তাই এর বিরুদ্ধে। সমাজবিপ্লবের জন্য সারা পৃথিবীতে এই আন্দোলন চলছে। পৃথিবী জুড়ে মানুষ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। সারা পৃথিবীর মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দেখছি সমাজে যে নিকৃষ্ট মানুষগুলো, তারা এখন কর্তৃত্ব করছে। ডোনাল ট্রাম্পের মত নিকৃষ্ট একজন মানুষ যার কথা ভাবা যায়না, সেই মানুষ সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা দেখছি কেমন করে ধর্ষণ চলছে, কেমন করে গণধর্ষণ চলছে আমাদের দেশে। একাত্তর সালে গণধর্ষণ চলেছে, এখন শিশুধর্ষণ চলছে। আমরা যে কোন একটা ঘটনা যদি দেখি, তাহলে দেখবো কেমন অবস্থা বাংলাদেশের রাজনীতির। ক'দিন আগে আমরা দেখেছি ছোট্ট একটা ঘটনা। একজন মা তার শিশুকে ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং নিজে আত্মহত্যা করল– এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আজকে বাংলাদেশে দিনে গড়ে ২৯ জন মানুষ আত্মহত্যা করছে এবং কত মানুষ যে আত্মহত্যার সামনে দাড়িয়ে আছে তার সীমানা নাই। কিন্তু ওই যে মা তার চার দিনের শিশুকে হাসপাতালের ছাদ থেকে ফেলে দিল এবং নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ল এর কারণ কী? নানা কারণ খুঁজে বের করা হবে– বলা হবে অসুস্থ ছিল মেয়েটি, বলা হবে ঝগড়া করেছিল। বাস্তবে অসুখ গোটা সমাজের। আজ সমাজে যেখানে মানুষ নিরাপদে নেই, যেখানে মানুষ আত্মহত্যা করে, যেখানে শিশুরা ধর্ষিত হয়, গণধর্ষিত হয়, যেখানে মানুষ গুম হয়, প্রতিদিন মানুষ খুন হয় এবং সড়ক দুর্ঘটনার নামে প্রতিদিন গড়ে দশ জন মানুষ খুনকরা হয়। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। এইজন্যই বামপন্থীদের ঐক্য দরকার। আমরা দেখছি সারা পৃথিবীব্যপী এই সংকট দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদ আজ পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলছে। বিজ্ঞানীরা বলছে– আর বারো বছর হাতে সময় আছে। এই বারো বছরের মধ্যে যদি নীতি পরিবর্তন করা না যায়, তাহলে এই গ্রহ, আমাদের এই পৃথিবী আর বসবাসের উপযোগী থাকবে না।

এই সংকটের সমাধান নির্বাচনে যাওয়ার লড়াই নয়। আগামীদিনে নির্বাচন হবে, বামপন্থীরা নির্বাচনে অংশ নেবেন কি নেবেন না সেটা অন্য কথা। নিলে আন্দোলনের অংশ হিসাবে নিবেন। আন্দোলনটাই আসল কথা, নির্বাচন আসল কথা নয়। আমরা ইন্দোনেশিয়ার খবর জানি। ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টিতে কোটি কোটি সদস্য ছিল এবং চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এর পরে সেটাই ছিল বড় কমিউনিষ্ট পার্টি। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে সেই কমিউনিষ্ট পার্টি একেবারে রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি চলে গেল। তারপর আমরা দেখেছি কি নৃশংসভাবে লক্ষ লক্ষ বামপন্থীদের হত্যা করা হয়েছে। পুঁজিবাদীরাই বলে অন্তত ১০ লক্ষ বামপন্থীকে হত্যা করা হয়েছে। কাজেই নির্বাচন দিয়ে যে সমাজে বিপ্লব আনা যাবে না– এটা আমরা জানি। কিন্তু নির্বাচন আন্দোলনের একটা অংশ হতে পারে।

আজকে যেটা প্রয়োজন তা হলো– এই যে জোট গঠিত হলো, এই জোটকে গ্রামে-গঞ্জে নিয়ে যাওয়া। এই জোটে মেহনতি মানুষকে আনা, কৃষককে আনা, ছাত্রকে আনা, নারীকে আনা, যুবককে আনা এবং এই আন্দোলন গড়ে তোলা। এই আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন, সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন। বিপ্লব একদিনের ব্যাপার নয়, কারো মুখের কথা নয়, বিবৃতি প্রদানের ব্যাপার নয়। বিপ্লবকে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হয়, আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়। এই কাজটা এখন বামপন্থীদের। সারাদেশ বামপন্থীদের দিকে তাকিয়ে আছে। এই যে বুর্জোয়ারা যে রাজনীতি করছে তার যে খেলা, তার যে নাটক, তার যে ভয়াবহ কৌতুকতা সেগুলো দেখে মানুষ দুঃখ পায়। কিন্তু মানুষ প্রতীক্ষায় থাকে– কারা আছে এদের বিকল্প, এদের বিরুদ্ধে কারা। এদের বিকল্প হলো বামশক্তি। আমরা অত্যন্ত আশান্বিত এদেশের মানুষ,এটা দেখে যে বামপন্থীরা একটা প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে। যে ঐক্য আমরা আগে কখনো দেখিনি এবং আমরা আশা করি এই ঐক্য আরো বিস্তৃত হবে, এই ঐক্য আরো গভীর হবে, আরো দৃঢ় হবে। এই ঐক্যের মধ্যে দিয়ে বাম রাজনীতি বাংলাদেশের মূল রাজনীতি হবে। এটা অসম্ভব নয়, যদি বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়। যদি তারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে ঐক্যবদ্ধ হয়।

একটা কথা বলে আমি শেষ করবো। সেটা হলো– বিপ্লব যে আমরা করবো তার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। জ্ঞান ছাড়া কখনো কোনো বিপ্লব সম্ভব হবে না। পরিবর্তন সম্ভব হবে, কিন্তু আমরা যে বিপ্লব এর কথা বলছি সে বিপ্লব সম্ভব নয়। বুর্জোয়াদের যে অর্জন জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সেই অর্জনকে আমাদের হার মানাতে হবে। হার মানাতে হবে আমাদের নৈতিকতায়। আমাদের নৈতিকতা তাদের নৈতিকতার চেয়ে ভিন্ন। তাদের নৈতিকতা ভোগবাদিতার, সম্পদ পাচারের, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, শোষণের। আমাদের নৈতিকতা সৃষ্টির, সাফল্যের, গড়ে তোলার এবং যা গড়ে তুলবো তা সকলের মধ্যে ভাগ করে নেবার। সেই যে নৈতিকতা, সেই যে জ্ঞানের চর্চা সেইটা খুব দরকার।

আমরা বাংলাদেশে দেখছি জ্ঞানের চর্চা খুব নীচু পর্যায়ে নেমে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র সংসদ নেই। রাষ্ট্রপতিরা বলেন, মন্ত্রীরা বলেন, রাজনৈতিক নেতারা বলেন যে– নির্বাচন হওয়া দরকার। কিন্তু নির্বাচন হয় না, হয় না এই কারণে যে শাসকশ্রেণী এই ছাত্র নির্বাচনকে ভয় পায়। কারণ এর মধ্যে দিয়ে যে কণ্ঠ বেরিয়ে আসবে, এখানে যে জ্ঞানের চর্চা হবে, এখানে যে সংস্কৃতির চর্চা হবে সেটাকে তারা ভয় পায়। এই জন্য গত আটাশ বছরে আমাদের দেশে কোন ছাত্র সংসদ নেই। এটি বৃটিশ আমলে অকল্পনীয় ছিল, পাকিস্তান আমলে অকল্পনীয় ছিল এবং বাংলাদেশে প্রথম যুগে অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু আজকের শাসকশ্রেণী এটিকে মেরে দিয়েছে এবং জ্ঞানের চর্চাকে নিরুৎসাহিত করছে, সংস্কৃতি চর্চাকে নিরুৎসাহিত করছে, নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলাকে নিরুৎসাহিত করছে।

কাজেই বামদের দিকে আজকে মানুষ তাকিয়ে আছে। তারা জ্ঞানে, নৈতিকতায় এবং আন্দোলনে বিপ্লবী চেতনায় এমন আন্দোলন করবে, যে আন্দোলন সমাজকে পাল্টে দেবে। যার জন্য এদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রতীক্ষা করছে। তাই কেবল আমি নই, এই যে ঐক্য গড়ে উঠেছে এই ঐক্যকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানায় সারাদেশের মানুষ এবং কামনা করে এই ঐক্য আরো গভীর, আরো দৃঢ় হোক, আরো বিস্তৃত হোক।

বাসদ (মার্কসবাদী) প্রার্থীদের কোদাল মার্কায় ভোট দিন

সিলেট–১
সদর, সিটি কর্পোরেশন
উজ্জ্বল রায়

চট্টগ্রাম–১১
চসিক ২৭–৩০, ৩৬–৪১ নম্বর ওয়ার্ড
অপু দাশগুপ্ত

ফেনী–২
সদর
জসীম উদ্দিন

রংপুর–৩
সদর, সিটি কর্পোরেশন
আনোয়ার হোসেন বাবলু

কুড়িগ্রাম–৪
রৌমারী, রাজিবপুর, চিলমারী (আংশিক)
মহিউদ্দিন আহমেদ মহির

চাঁদপুর–৩
সদর, হাইমচর
আজিজুর রহমান

ঢাকা–১৬
উত্তরের ২–৬ নম্বর ওয়ার্ড
নাঈমা খালেদ মনিকা

বগুড়া–৫
শেরপুর, ধুনট
রঞ্জন কুমার দে

জয়পুরহাট–২
আক্কেলপুর, কালাই, ক্ষেতলাল
শাহজামান তালুকদার

দিনাজপুর–৪
খানসামা, চিরিরবন্দর
সাজেদুল আলম চৌধুরী

বামপন্থীদের কাছে প্রত্যাশা

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলাদেশে আমরা বহু রাজনৈতিক দল দেখছি, জোট দেখছি, অনেক জোট গঠিত হচ্ছে। কিন্তু আসল কথা হলো এটা যে – বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল অনেক, কিন্তু রাজনীতির ধারা দুইটি। একটা ধারা বুর্জোয়াদের, একটা ধারা বামপন্থীদের। এই দুই ধারা একেবারেই স্বতন্ত্র ধারা। আমরা যাদেরকে বুর্জোয়া বলি তারাই ক্ষমতায় থাকে, তারা লুটপাট করে, তারা ভোট করে এবং তারাই দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে। এই যে ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থায় রাজনীতির প্রধান সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে – সেই জোটরা কে কতটা ওই ভোগের, ওই লুটের, ওই সম্পদ পাচারের সুযোগ পাবে। প্রতিযোগিতা চলছে তার ভিত্তিতে। তার বিপরীতে যে শক্তি, সে শক্তি হলো বাম শক্তি। এই যে শক্তি, এই শক্তির সাথে সেই বুর্জোয়া শক্তির যে অবস্থান তা ভিন্ন বিকল্প নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বুর্জোয়া রাজনীতির সাথে বাম রাজনীতির সন্ধির, আপোষের কোন সুযোগ নাই। পানির সাথে যেমন তেল মিশবে না, তেমনি এই দুই কখনো মিলবে না।

তাই যখন বামজোট গঠিত হয়, তখন আমরা আশান্বিত হই এই ভেবে – এটা কেবল একটা জোট নয়, এটা কোন নির্বাচনী জোট নয়, এটা একটা আন্দোলনের শক্তি এবং সেই আন্দোলন এদেশের রাষ্ট্রে পরিবর্তন আনবে, এদেশের সমাজে পরিবর্তন আনবে– মানুষ যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষা করছে। যুগ যুগ ধরে, শত শত বছর ধরে মানুষ প্রতীক্ষা করছে যে সামাজিক বিপ্লবের, সেই সামাজিক বিপ্লব ঘটবে। আমরা বৃটিশ আমলের রাজনীতি দেখেছি, পাকিস্তানের তেইশ বছরের রাজনীতি দেখেছি, আজকে সাতচল্লিশ বছর বাংলাদেশের রাজনীতি দেখছি। এই সমস্ত রাজনীতি একই রাজনীতি। যদিও পোশাকে, নামে, রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে রাজনীতিগুলো ভিন্ন। ভিন্ন এই রাজনীতি হলো ব্যক্তি মালিকানাকে কায়েম রাখা। এই রাজনীতি হচ্ছে লুণ্ঠন, শোষণ, ভোগবাদিতা, সম্পদ পাচার এগুলোকে বিদ্যমান রাখা। এবং সেই রাজনীতিসবাই করেছে। বৃটিশ আমলে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ করেছে, পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ-আওয়ামী লীগ করেছে। এখনো একই রাজনীতি চলছে মূল জায়গায়। কাজেই বামপন্থীদের কর্তব্য হচ্ছে – এই *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org